SIR

বিহার ও বাংলায়

যোগেন্দ্র যাদব

জ্ঞানগঞ্জ,
উপনিবেশ - বিরোধী চর্চা/ কর্পোরেট - বিরোধী চর্চা

SIR বিহারে ও বাংলায়

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী, কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা ৭০০০০৮-এর পক্ষে SIR বিহারে ও বাংলায় প্রকাশ করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ প্রজ্ঞা চৌধুরী

জ্ঞানগঞ্জের প্রতিটি প্রকাশনা এবং তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য https://gyangonjo.org/

মুদ্রণ জ্যোতি লেজার পয়েন্ট ৬৩/২ ডি সূর্য সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯
গ্রন্থন পাইওপিয়র ট্রেডার্স ১৬ ই পাটোয়ার বাগান লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
সামগ্রিক তত্ত্বাবধান আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৫০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

নাগরিকত্ব কখনোই শুধু আইনের বইয়ের পাতায় থাকা একটি শব্দ নয়; নাগরিকত্ব মানুষের মুখের ভাষা, হাঁটার পথ, এবং নিজের বাড়িতে, নিজের নামে বাঁচার অধিকারের নাম। জ্ঞানগঞ্জের ৩৮ পুথিতে ঠাঁই হওয়া সমাজবিজ্ঞানী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী যোগেন্দ্র যাদবের ২৩ নভেম্বর, ২০২৫-এ কলকাতার ভারত সভা হলের বক্তৃতা বর্তমান ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত তীব্র বিতর্কের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও গভীর সারসংক্ষেপ (এই অনুষ্ঠানে অন্য দুজন বক্তা ছিলেন সুজাত ভদ্র, শক্তিমান ঘোষ)। নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) এবং সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে নাগরিক-অনাগরিক বিভাজনের যে রাজনীতি সক্রিয় হয়েছে, তা ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্তিমূলক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমতাভিত্তিক চেতনার বিরুদ্ধে এক সুপরিকল্পিত আঘাত। এই পুস্তিকার সরল উদ্দেশ্য—যোগেন্দ্র যাদবের বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্যকে কাঠামো ধরে—নাগরিকত্বের এই সঙ্কট কেবল মামলা-মোকদ্দমার আইনি দিক থেকে নয়, বরং তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা। সেই বিচারে তানিয়া সাঈদের 'বায়ো-রাজনীতি' তত্ত্ব, ভার্জিনি আন্দ্রে-ডগলাস প্র্যাটের 'ধর্মীয় নিরাপত্তাকরণ' ধারণা, রোমিলা থাপার-গৌতম ভাটিয়াদের সাংবিধানিক বিশ্লেষণ এবং গীতা হরিহরণ-সালিম ইউসুফজির নাগরিক প্রতিরোধের দলিলসমূহ এই বীক্ষণের সহকারী প্রধান হাতিয়ার হতে পারে। পাশাপাশি, ফ্রন্টলাইন, লাইভ ল' ও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এ প্রকাশিত বেশ কিছু সাম্প্রতিক প্রতিবেদন ও পরিসংখ্যান এই তাত্ত্বিক আলোচনাকে বর্তমান ভারতের মাঠে-ময়দানের কর্কশ বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করাবে।

ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো প্রস্তাবিত 'বায়ো-পলিটিক্স' বা জৈব-রাজনীতি ধারণাটি নাগরিকত্বের সমসাময়িক বিতর্ক বুঝতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, আধুনিক রাষ্ট্র জনগণের 'জীবন'-কে নিয়ন্ত্রণ, শ্রেণিবিন্যাস ও পরিচালনার লক্ষ্যে নানা কৌশল প্রয়োগ করে। তানিয়া সাঈদ তাঁর 'দ্য বায়োপলিটিক্স অফ সিটিজেনশিপ' গ্রন্থে এই ধারণাকে নাজি জার্মানি ও আসামের প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন কীভাবে রাষ্ট্র 'জনসংখ্যার একটি অংশকে জৈবিক (biological) ও নৃতাত্ত্বিক (anthropological) ভিত্তিতে 'অস্বাভাবিক', 'অনুপযুক্ত' ও 'বহিস্কারযোগ্য' হিসেবে চিহ্নিত করে' (সাঈদ, ২০১৬, পৃ. ৪৫)। এই

প্রক্রিয়ায় নথিপত্র, জন্মস্থান, বংশপরম্পরা ও ধর্মীয় পরিচয় 'বৈধতা' যাচাইয়ের হাতিয়ারে পরিণত হয়। সাঈদ লক্ষ্য করেন, আসামে এনআরসি প্রক্রিয়া 'নাজি জার্মানির 'নুরেমবার্গ আইন'-এর মতোই একটি বায়োমেট্রিক সার্ভিলেন্সের কাঠামো তৈরি করে, যার লক্ষ্য নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীকে নাগরিক সমাজ থেকে বহিষ্কার করা' (সাঈদ, ২০১৬, পৃ. ১০২)।

এই বায়ো-রাজনীতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ হলো 'নিরাপত্তাকরণ' (Securitization)। ভার্জিনি আন্দ্রে ও ডগলাস প্র্যাট 'রিলিজিয়াস সিটিজেনশিপস অ্যান্ড ইসলামোফোবিয়া' গ্রন্থে বলেন, সমসাময়িক বিশ্বে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়কে 'বিদ্যমান হুমকি' হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, যার ফলে 'মুসলিম নাগরিকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সন্দেহ ও নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের প্রিজম দিয়ে যাচাই করা হয়' (আন্দ্রে ও প্র্যাট, ২০১৫, পৃ. ৭৮)। তানিয়া সাঈদই তাঁর আরেকটি গ্রন্থ 'ইসলামোফোবিয়া অ্যান্ড সেকিউরিটাইজেশন'-এ এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট বলেন, 'মুসলিম নারীর হিজাব বা মুসলিম পুরুষের দাড়ি কেবল ধর্মীয় চিহ্ন নয়, বরং তা 'সন্ত্রাসবাদের প্রতীক' হিসেবে পুনরায় নির্মিত হয়, যা পুরো সম্প্রদায়কে নাগরিকত্বের দৃষ্টিতে সন্দেহের আওতায় নিয়ে আসে' (সাঈদ, ২০১৬, পৃ. ১২৩)। যোগেন্দ্র যাদব তাঁর বক্তৃতায় এই তাত্ত্বিক বাস্তবতাকেই জনগণের ভাষায় অনুবাদ করেছেন। মনে রাখবেন, আজ যদি আপনার নামে সন্দেহ হয়, কাল আপনার বাড়ি নিয়ে সন্দেহ হবে, পরশু আপনার ধর্মে সন্দেহ হবে। এই সন্দেহের সিঁড়ি বেয়েই একটি সম্পূর্ণ সম্প্রদায়কে 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক' বানানোর প্রক্রিয়া চলছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো বোঝার পর এই প্রক্রিয়ার বাস্তব ও পরিসংখ্যানগত রূপটি দেখা জরুরি। আসামে ২০১৯ সালে চূড়ান্ত হওয়া জাতীয় নাগরিক পঞ্জির (এনআরসি) তথ্য অনুযায়ী, মোট ৩.৩ কোটি আবেদনকারীর মধ্যে ১৯ লক্ষ ৬ হাজার ৬৫৭ জন ব্যক্তির নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে। এই বিপুল সংখ্যক 'বিতর্কিত' নাগরিকের ভাগ্যে কী পড়েছে, তা এখনও অস্পষ্ট, কিন্তু মানবাধিকার সংগঠনগুলির রিপোর্ট বলছে, এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশই হচ্ছেন দরিদ্র, দলিত, মুসলমান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ, যাদের কাছে প্রজন্ম-প্রাচীন নথি সংরক্ষণের সামর্থ্য বা সচেতনতা ছিল না।

এই প্রক্রিয়া শুধু আসামেই সীমাবদ্ধ নেই। ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন ('ইলেকশন কমিশন, বিহার অ্যান্ড ডিসএনফ্র্যানচাইজমেন্ট') এই তথ্য উন্মোচন করে যে, কীভাবে বিহার রাজ্যে ২০২৩ সালের ভোটার তালিকা সংশোধনী প্রক্রিয়ায় প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, বহু মানুষকে 'ডি- ডুপ্লিকেশন' নামক একটি স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তালিকা থেকে অপসারণ করা হয়, যার বিরুদ্ধে আপিল করতে গিয়ে তারা জড়িয়ে পড়েন জটিল আমলাতান্ত্রিক জালে। যোগেন্দ্র যাদব এই ঘটনাকে 'গণতান্ত্রিক অন্তর্ধানের লক্ষণ' বলে উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন, ভোটার তালিকা থেকে কাউকে বাদ দেওয়া মানে তাকে রাষ্ট্রের চোখে অদৃশ্য করে দেওয়া। এটি শুধু ভোটাধিকার হরণ নয়, তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা।

নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইনি সংশোধনী ও এর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা ভারতীয় বিচারব্যবস্থার সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা তৈরি করেছে। লাইভ ল' পত্রিকায় প্রকাশিত 'এক্সপ্লেইন্ড: পিটিশনার্স আর্গুমেন্টস ইন সুপ্রিম কোর্ট' শীর্ষক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়, সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলায় বাদীরা যুক্তি দেখান যে নাগরিকত্ব নির্ধারণের নতুন প্রক্রিয়াগুলি সংবিধানের মৌল কাঠামো (বেসিক স্ট্রাকচার)-এর উপরই আঘাত হানে। তাদের প্রধান যুক্তিগুলির মধ্যে ছিল: (ক) এটি ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদানের পথ তৈরি করে, যা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির পরিপন্থী; (খ) এটি নারী ও দলিতদের ওপর অসমভাবে প্রভাব ফেলে, কারণ তাদের কাছে প্রয়োজনীয় নথির অভাব বেশি; এবং (গ) এটি 'বৈধ প্রক্রিয়া' (Due Process) ও 'সমতার অধিকার' লঙ্ঘন করে।

এই আইনি বিতর্কের গভীরে প্রবেশ করতে গেলে রোমিলা থাপার, এন. রাম, গৌতম ভাটিয়া ও গৌতম প্যাটেল সম্পাদিত 'অন সিটিজেনশিপ' গ্রন্থের দিকে ফিরে তাকানো জরুরি। এই সংকলনে গৌতম ভাটিয়া তাঁর রচনায় স্পষ্ট বলেন, 'ভারতের সংবিধানের ৫ থেকে ১১ ধারা নাগরিকত্বের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে, এবং এই ধারাগুলির মর্মার্থ হলো অন্তর্ভুক্তি, বহিষ্করণ নয়। সংবিধান প্রণেতারা কখনোই চাননি যে নাগরিকত্ব একটি নজরদারিমূলক ও শাস্তিমূলক প্রক্রিয়ায় পরিণত হোক' (থাপার, রাম, ভাটিয়া, প্যাটেল, ২০২১, পৃ. ১৫৬)। তিনি আরও বলেন

নাগরিকত্বের প্রশ্নে রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতা সীমিত করার জন্যই সংবিধানে মৌল অধিকারগুলি যুক্ত করা হয়েছে। যোগেন্দ্র যাদব প্রায়শই এই সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই সামনে নিয়ে আসেন, তাঁর মতে, সংবিধান আমাদের 'রক্ষাকবচ' দেওয়ার জন্য, 'শিকল' পরানোর জন্য নয়। নাগরিকত্বের আইন যদি সেই রক্ষাকবচকে দুর্বল করে, তবে তা শুধু আইনের পরাজয় নয়, প্রজাতন্ত্রের পরাজয়।

নাগরিকত্বের এই সংকট নারীদের ওপর একটি অতিরিক্ত ও জটিল আঘাত হেনেছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় প্রকাশিত 'এসআইআর কুড রোল ব্যাক ডিকেডস অফ প্রোগ্রেস ইন উইমেন্স পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত ব্যাখা করা হয়েছে কীভাবে নথিপত্র-ভিত্তিক নাগরিকত্ব প্রমাণের ধারা নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। ভারতীয় সমাজে জন্মনিবন্ধন, বিয়ে-সনদ বা বংশ পরিচয় প্রমাণের দলিলে নারীর নাম প্রায়শই উপেক্ষিত হয়। প্রবন্ধে উদ্ধৃত একটি গবেষণা অনুসারে, গ্রামীণ ভারতে ৪২% নারীর কোনো সরকারি পরিচয়পত্র নেই, এবং দলিত ও আদিবাসী নারীদের মধ্যে এই হার ৬০% ছাড়িয়ে যায়। ফলে, যখন নাগরিকত্ব বা ভোটার তালিকাভুক্তির জন্য নির্দিষ্ট নথির দাবি করা হয়, তখন নারীরা একটি দুষ্টচক্রে পড়ে যান: নথি না থাকায় তারা তালিকাভুক্ত হতে পারেন না, আর তালিকাভুক্ত না থাকায় তাদের নাগরিকত্বই সংশয়াতীত হয় না।

এই দ্বি-স্তরীয় প্রান্তিককরণ (প্রথমত নারী হিসেবে, দ্বিতীয়ত সংখ্যালঘু বা দরিদ্র হিসেবে) সম্পর্কে তানিয়া সাঈদ তাঁর গবেষণায় সতর্ক করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'নিরাপত্তাকরণের রাজনীতি শুধু পুরুষ মুসলিমকেই লক্ষ্য করে না; এটি মুসলিম নারীকেও 'সম্প্রদায়ের প্রজননকারী' ও 'সাংস্কৃতিক বাহক' হিসেবে চিহ্নিত করে, ফলে তাদের দেহ ও সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়' (সাঈদ, ২০১৬, পৃ. ১৬৭)। একজন মা যখন তাঁর সন্তানের জন্মপ্রমাণ জোগাড় করতে পারেন না কারণ হাসপাতালে তাঁর নাম লেখা হয়নি, বা পঞ্চায়েত প্রধান তাঁর বাবার নাম বলতে বলেন—এটি শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, এটি নারীকে তাঁর নিজের জীবন সম্পর্কে বলার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার রাজনীতি।

এই সুপরিকল্পিত বহিষ্করণের রাজনীতির বিরুদ্ধে কিন্তু ভারত জুড়ে একটি শক্তিশালী নাগরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধও গড়ে উঠেছে। গীতা হরিহরণ ও সালিম ইউসুফজি সম্পাদিত 'ব্যাটলিং ফর ইন্ডিয়া: আ সিটিজেন্স রিডার' এই প্রতিরোধেরই এক জীবন্ত আর্কাইভ। এই সংকলনে শাহীনবাগ থেকে শহিদ মিনার পর্যন্ত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা সাধারণ মানুষের আন্দোলনের দলিল, কবিতা, বক্তব্য ও বিশ্লেষণ সংরক্ষিত আছে। সংকলনের ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন, 'এই বই নাগরিকত্বের শুধু একটি আইনি সংজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করে না, বরং নাগরিক হওয়ার অর্থ কী—সেই ধারণাকেই পুনর্বিন্যাস করার চেষ্টা করে। নাগরিকত্ব শুধু পাওয়া কিছু নয়, বরং রোজ তৈরি করা কিছুর সংকলন' (হরিহরণ ও ইউসুফজি, ২০১৯, পৃ. xxiii)।

এই ধারনা ভারতীয় মুসলমানদের দৈনন্দিন সংগ্রামের সাথেও মেলে। তারা এভাবেই নাগরিকত্বের সহজ স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যানের মুখে, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন, পাড়া মহল্লার সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যেই 'শান্তি' ও 'অন্তর্ভুক্তি' রচনা করেন। এটি একটি নিচুতলার, জীবনমুখী গণতন্ত্রের চিত্র তুলে ধরে, যা রাষ্ট্রীয় বহিষ্কারের যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। যোগেন্দ্র যাদবের সমগ্র রাজনৈতিক চিন্তাধারার কেন্দ্রেও এই 'নিচুতলার গণতন্ত্র' ও 'নাগরিক সক্রিয়তা'-র ধারণাই বিদ্যমান। তাঁর মতে সমাধান শুধু আদালতের রায়ে নয়, বরং রাস্তায়, মাঠে, মানুষের সমাবেশে এবং সর্বোপরি, প্রতিটি নাগরিকের বিবেকে। তিনি আহ্বান জানান একটি গণ-আলোচনার, যেখানে নাগরিকত্বের সংজ্ঞা হবে সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত 'আমরা ভারতের জনগণ'-এর কল্যাণে, কোনো সংকীর্ণ রাজনৈতিক এজেন্ডার অধীনে নয়।

যোগেন্দ্র যাদবের ভাষণ ও লেখনকর্ম, এই সমগ্র বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, কেবল একজন বক্তার মত নয়; এটি চরম সতর্কবার্তা এবং গণতন্ত্রের নির্ণায়ক পুনরুদ্ধারের একটি কর্মসূচি। পরিসংখ্যানের শুষ্ক সংখ্যাগুলো—১৯ লক্ষ মানুষ বাদ পড়া, ৪২% নারীর পরিচয়পত্র না থাকা—এই তাত্ত্বিক আলোচনাকে রক্তমাংসের মানবিক ট্র্যাজেডিতে পরিণত করে।

নাগরিকত্বের বর্তমান সঙ্কট ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য একটি

অস্তিত্বসংকট। এটি প্রশ্ন তোলে আমরা কী ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্র গড়তে চাই: একটি এমন সমাজ যেখানে মানুষ কাগজের টুকরোর ভিত্তিতে সন্দেহের পণ্য, নাকি একটি এমন প্রজাতন্ত্র যেখানে সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত মর্যাদা ও অধিকারই নাগরিকত্বের একমাত্র ভিত্তি? যোগেন্দ্র যাদবের বক্তব্য আমাদের দ্বিতীয় পথটিরই সন্ধান দেয়। তাঁর ভাষায়, নাগরিকত্বের লড়াইয়ে জয়ের মানে শুধু একটা আইন বাতিল করা নয়; এর মানে মানুষের উপর রাষ্ট্রের আস্থা ফিরিয়ে আনা। কারণ যে রাষ্ট্র তার নিজের জনগণকে বিশ্বাস করে না, সেই জনগণও একদিন রাষ্ট্রকে বিশ্বাস করা বন্ধ করে দেবে। সেই ভয়াবহ অবিশ্বাসের খাদ থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করাই আজকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

অত্রি ভট্টাচার্য,

১৫ই জানুয়ারী, ২০২৫

গ্রন্থপঞ্জি

Saeed, Tania. (2016). The Biopolitics of Citizenship: Lessons from Nazi Germany and Assam. Palgrave Macmillan.

Andre, Virginie & Pratt, Douglas. (2015). Religious Citizenships and Islamophobia. Routledge.

Saeed, Tania. (2016). Islamophobia and Securitization: Religion, Ethnicity and the Female Voice. Palgrave Macmillan.

Thapar, Romila; Ram, N.; Bhatia, Gautam; Patel, Gautam (Eds.). (2021). On Citizenship. Aleph Book Company.

Hariharan, Githa & Yusufji, Salim (Eds.). (2019). Battling for India: A Citizen's Reader. Speaking Tiger.

'Election Commission, Bihar & Disenfranchisement.' Frontline, The Hindu.

'Explained: Petitioners' Arguments in Supreme Court Against SIR.' LiveLaw.

'SIR Could Roll Back Decades of Progress in Women's Political Participation.' The Indian Express.

SIR: বিহার ও বাংলা
আলোচনা সভা
ভারত সভা হল
ভারত সভা
INDIAN ASSOCIATION

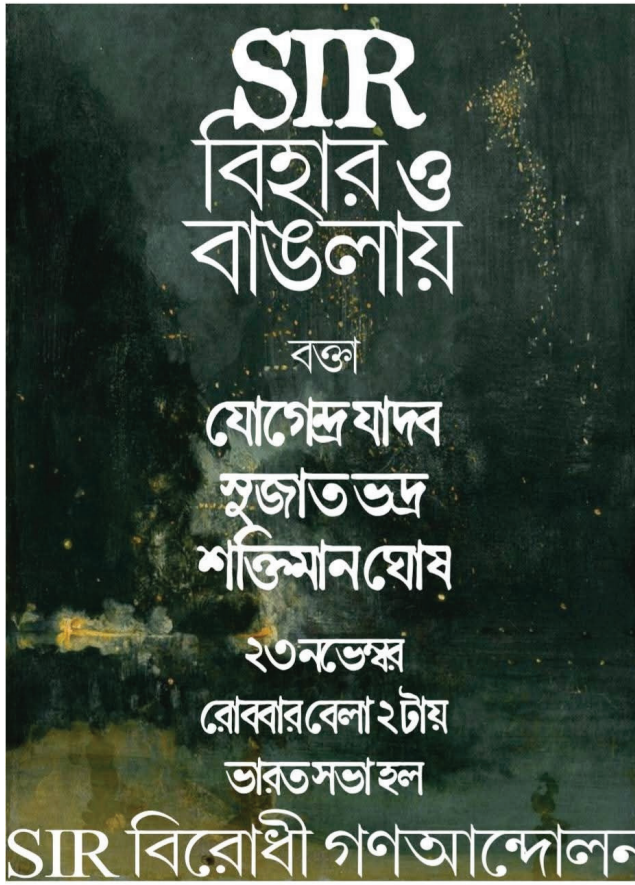
SIR
বিহার ও
বাঙলায়
বক্তা
যোগেন্দ্র যাদব
সুজাত ভদ্র
শক্তিমান ঘোষ
২৩ নভেম্বর
রোববার বেলা ২টায়
ভারত সভা হল
SIR বিরোধী গণআন্দোলন

যোগেন্দ্র যাদবের বক্তৃতা

বন্দেমাতরম।

শক্তিমান [ঘোষ]দাদা, সুজাত ভদ্রজী, প্রসূন ভৌমিক, ছোটন দাস এবং এই সভায় আগত প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। শুরুতে বোঝাব এসআইআর-এ কি হতে যাচ্ছে। দ্বিতীয়পর্বে আমি বোঝাব এসআইআর-এ আপত্তিজনক কি কি আছে? কেন আমরা এর বিরোধিতা করছি? শেষ পর্বে আমি বলব, আমদের কি পদক্ষেপ হওয়া উচিৎ? আমি, অধ্যাপকদের মত, প্রায় সকলের জানা কয়েকটা বেসিক পয়েন্ট উল্লেখ করে আজকের বক্তৃতাটা পেশ করব, এই সুযোগটা আমায় আপনারা দেবেন আশা করি।

ভোটার লিস্টে মাঝেমাঝেই রিভিশন হয়। নতুন কিছু নয়। ২০২৪-এর নির্বাচনের পরেও গোটা দেশে ভোটার লিস্ট রিভিশন হয়েছে। যে সব রাজ্যে নির্বাচন ছিল না, সে সব রাজ্যেও ভোটার লিস্টের রিভিশন হয়েছে। পুরো দেশে নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি ২০২৪-এ। তাহলে এই নতুন ভোটার লিস্ট রিভিশন করার আবার প্রশ্ন ওঠার কি দরকার? মাথায় রাখুন পশ্চিমবাংলায় যদি এসআইআর না হত, তাহলে এখানে নভেম্বর, ডিসেম্বরে এসএসআর – স্পেশল সামারি রিভিশন হত। সেই পদ্ধতিতে কিছু মানুষের নাম কাটা যায়। কিছু মানুষের নাম তালিকায় ওঠে। এই কাজটা নির্বাচন কমিশন নিয়মিত করে থাকে।

এখন কি হচ্ছে? যে ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় আছে, তাকে একটা এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। ধরা যাক আপনি। এই ফর্মে আপনার নাম, ভোটার কার্ড ইত্যাদি বিবরণ উল্লিখত আছে। ফর্মে আপনাকে কিছু অতিরিক্ত বিবরণ লিখতে হবে। ফর্মে আপনার পুরোনো ফটো আছে, আপনাকে নতুন ফটো লাগাতে হবে। এবং এই ফর্মে আপনার পরিবারের একজন সদস্যকে চিহ্নিত করতে হবে অথবা কোনও সদস্যর নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় আছে, এটা আপনাকে প্রমান করে দেখাতে হবে। আপনাকে বলতে হবে, আপনার নাম ২০০২-এর তালিকায় ছিল, আর আপনার নাম যদি না থাকে তাহলে বলতে হবে

আপনার বাবা বা নির্বাচন কমিশনের [এবার থেকে শুধু কমিশন] তালিকা অনুযায়ী আপনার কোনও পারিবারিক সদস্য যেমন ঠাকুর্দার নাম। তার বিধানসভা অঞ্চল, বুথ আর সিরিয়াল নম্বর দিয়ে বলতে হবে তার নাম কোথায় ছিল। আপনাকে কোনও ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে না। আপনাকে ৪ ডিসেম্বরের আগে এই ফর্ম জমা করতে হবে।

বাংলায় এই দুটো পরিবর্তন হল। বিহারে আত্মীয়তা জুড়তে হত না – শুধু নিজের নাম দিলেই হত। আর শুরুতে ডকুমেন্টস জমা করার বিষয়ে কমিশন বলেছে প্রথমে ফর্ম ভর্তি করার সময় আপনার ডকুমেন্টস দেওয়ার দরকার নেই। ৪ তারিখ পর্যন্ত যত ফর্ম এসেছে, কোনওটা নিয়েই তদন্ত না করে সে একটা তালিকা তৈরি করবে। এর নাম ড্রাফট ইলেক্টোরাল রোল। এসআইআর শুরুর সময়ে বাংলায় মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৭ কোটি, ৬৭ লাখ, ৫০ হাজার। ৪ ডিসেম্বরের আগে যত এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়েছে, তার নতুন তালিকা কমিশন দেবে ৪ ডিসেম্বর; আর যে সব নাম তালিকায় ছিল না, অথচ যারা নতুন আবেদন করেছেন - মাথায় রাখতে হবে এটা বিহারে ছিল না - নতুন ৪ ডিসেম্বরের তালিকায় সে নামও জুড়বে। এটাই ড্রাফট ইলেক্টোরাল রোল। যার নাম পুরোনো লিস্টে আছে, কিন্তু ড্রাফট ইলেক্টোরাল রোলে থাকবে না, তার কোনও রকম লিগাল রাইট থাকবে না। এটা খুবই ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এতদিন ভোটার লিস্ট থেকে নাম কাটতে গেলে আপনাকে নোটিশ দিতে হত, হিয়ারিং করাতে হত, হিয়ারিং-এ এসডিএম অর্ডার করবে, আপনার যদি মনে হয় অর্ডার ঠিক ভাবে হয় নি তা হলে আপনি আপিল করতে পারেন। মাথায় রাখবেন ৪ ডিসেম্বরের ভোটার তালিকায় যদি আপনার নাম না আসে, তাহলে কোনও নোটিশ হবে না, কোনও হিয়ারিং হবে না, কোনও আপিলও আপনি করতে পারবেন না। ৪ তারিখ থেকে আপনার সব রকম সাংবিধানিক অধিকার লুপ্ত হয়ে যাবে। যারা ভোটার লিস্ট থেকে বাদ পড়ছেন, তাদের প্রতিবাদ শোনার জন্য জন্য এখনও পর্যন্ত কমিশন কোনও নীতি তৈরি করে নি। ফর্ম নম্বর ৬, ৭, ৮ থাকলেও এই প্রক্রিয়ার জন্য কোনও ফর্ম নেই। আপনি এনিউমারেশন ফর্ম জমা দিলেন, কিন্তু বিএলও সেটা আপলোড করল না, তাহলেও আপনি বেনাগরিক, আপনার সব রকম সাংবিধানিক অধিকার লুপ্ত হবে। আপনি যে বলবেন,

আমি বিএলওকে ফর্ম ভর্তি করে দিয়েছিলাম, কিন্তু সে সেটা আপলোড করে নি – এই কথা বলার জন্য কোনও প্রক্রিয়া নেই।

এটা গেল প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপে কমিশন যদি দেখে আপনি আত্মীয় বেছে নেওয়ার জায়গাটি ফাঁকা ছেড়ে গেছেন, তাহলে আপনার কাছে নোটিশ আসবে। অথবা আত্মীয়তার বিষয়টা তদন্ত করে কমিশন যদি স্যাটিসফায়েড না হয়, তাহলেও নোটিশ আসবে, আপনি প্রমান করতে পারেন নি, আপনার আত্মীয় ২০০২-এর তালিকায় ছিলেন। আত্মীয় বলতে কমিশন শুধু বোঝে বাবা, ঠাকুর্দা। কিন্তু ঠাকুমার নাম দেওয়া যাবে কি না সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু মায়ের বাবা বা দাদুর নাম তোলা যাবে? তাও পরিষ্কার না। কারন কমিশনের নির্দেশে আছে আত্মীয়, কিন্তু মেনুতে আছে বাবা/ঠাকুর্দা। আর কিছু নেই।

যাই হোক কমিশন যদি মনে করে আপনার দেওয়া তথ্য ঠিক না, তাহলে নোটিশ আসবে। কি নোটিশ আসবে? আমরা আপনার এখনও সন্তুষ্ট হই নি, আপনার যদি কোনও নাগরিকত্ব প্রমানের নথি থাকে তো জমা দিন। আপনি ভাবছেন নথি হিসেবে আমার কাছে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড আছে। কিন্তু এ সব কমিশন আপনার পরিচয়পত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় নি। আপনার কাছে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ফটো আইডেন্টিটিকার্ড আছে, কমিশন বলবে এটাকে আমি চিনিই না। ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড নিয়েও একই কথা বলবে। মনরেগা কার্ডের স্বীকৃতি নেই। যে সব নথি সাধারণভাবে জনগণের জিম্মায় থাকে, সে সব তারা চেনেই না। তারা কোন নথি স্বীকার করছে? পাসপোর্ট। কত জনের আছে? সে কি জন্মপত্র স্বীকার করে? আমি যখন সুপ্রিম কোর্টে বললাম, প্রধান বিচারপতি বললেন আমারও জন্মপত্র নেই। ভাবুন। আমার কথা বলি। আমার বাবা-মা দুজনেই শিক্ষক। আমার জন্ম সরকারি হাসপাতালে হয়েছে। আমারও জন্মপত্র নেই।

তৃতীয়, মেট্রিকুলেশন আর ডিগ্রির শংসাপত্র যেখানে জন্মের তারিখ উল্লেখ করা থাকে। যে মেট্রিক পাশ করে নি, তার কি হবে? এই দেশে মেট্রিক পাশ না করা কি ক্রাইম? ১৯৪৭-এ আমরা প্রত্যেকেই একটা ভোটের অধিকারী হয়েছিলাম – আম্বানির যদি একটা ভোট থাকে

তো আমারও একটা ভোট – 'নোট এক না হো, ভোট তো বরাবর হৈ' – ওরও এক ভোট, আমারও এক ভোট। এরপরে তারা এনআরসির সার্টিফিকেট চাইছে। দেশে কোথাও এনআরসি হয় নি – অথচ কমিশন এনআরসির শংসাপত্র চাইছে। কেন? আপনার কাছে যদি পাক্কা সরকারি চাকরির নথি থাকে তাহলেই একমাত্র ভোটার হিসেবে পাস করা সম্ভব। এছাড়া ১৯৮৭র আগের ব্যাঙ্কের পাসবুক থাকলেও। কজন রাখে? আর তারা চায় জঙ্গল অধিকার আইন অনুযায়ী বনের পাট্টা। বাংলায় কত আছে আমার আন্দোলনের বন্ধুরা নিশ্চই বলতে পারবেন। বিহারে [যেখানে জঙ্গল অনেক বেশি] আজ পর্যন্ত ১৯১টা পাট্টা দেওয়া হয়েছে। বাঙলায়?

অর্থাৎ আপনার কাছে যে সব নথি আছে সে সব কমিশন মানছে না, আর আপনার কাছে যে সব নথি সাধারণভাবে থাকার কথা নয়, সেটা সে দাবি করছে। এই জন্যই আমরা আধারের মান্যতা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম। এটা ওদের নথিতে আছে। এটা আমি কোর্টে বলি নি, বিচারপতি [জয়মাল্য] বাগচী বলেছেন। তিনি কোর্টে বলেছেন, কমিশন ২০২২-এ নিয়ম সংশোধন করে বলেছেন নাগরিকত্বের ইস্যুতে আধার মান্য নথি; আর আজ বলছে, আমি আধার মানি না? তারা বরাবার সুপ্রিম কোর্টে বলেছে তারা আধারের স্বীকৃতি দিচ্ছে না। কারন আধার নাগরিকতার প্রমান নয়। ঠিক আছে, মেনে নিলাম। তাহলে তো প্রশ্ন ওঠে বনাধিকারের পাট্টা কিভাবে নাগরিকতার প্রমান হয়? ব্যাঙ্কের পাসবই কিভাবে নাগরিকতার প্রমান হয়? ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট কিভাবে নাগরিকতার প্রমান হয়? কেউ যদি নেপাল থেকে এসে ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট বাগিয়ে নেয়, তাহলে কি সে নাগরিক হয়ে যাবে? এ কথা আমি বলি নি, আদালতের বিচারপতিরা বলেছেন। কিন্তু আধারকে স্বীকৃতি দেব না। কারন যদি কমিশন আধারকে স্বীকৃতি দেয়, তাহলে ভোট কাটার চক্কর বন্ধ হয়ে যাবে। এটাই দ্বিতীয় পর্ব। আপনার থেকে নথি চাইবে। বাঙলার ৭ কোটি ৭০ লক্ষের মধ্যে ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটির থেকে নথি চাওয়া হবে। বিজেপি বিহারে নিজের ভোটারকে হয়রান করেছে। এখন কমিশন বুঝেছে বিজেপির ভোটারকে ঝামেলায় ফেলার অধিকার তাদের নেই।

আপনি নথি দিলেন। কিন্তু সেই নথিকে কিভাবে বিচার করবে কমিশন? তার তো কোনও রাস্তা, কোনও স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর,

প্রোটোকল বলা নেই। ফলে এ ক্ষেত্রে ইআরও-র ভূমিকা চূড়ান্ত। ধরে নিন যোগেন্দ্র যাদব আর শক্তিমান ঘোষ এক ধরণের কাগজ দিয়েছে। ইআরও বলতেই পারে শক্তিমান ঘোষের কাগজ আমি মানছি, কিন্তু যোগেন্দ্র যাদবের কাগজকে আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি না। অথচ কমিশনের প্রতিটা ছোট ছোট কাজ সমাপনের নিয়ম আছে। যে লোকটা পার্কে থাকে, ফুটে রাতে শোয়, তাকে কিভাবে ভোটার বানানো যায়, তার বিশদ বিবরণ আছে। অথচ আপনার দেওয়া নথি স্বীকার করার কোনও প্রসেস নেই। এটা সমস্যা। ৪ ডিসেম্বর ড্রাফট লিস্ট আসবে। ১ মাস আপনার দেওয়া তথ্য কমিশন বিচার করবে। ৩১ অবদি ভেরিফিকেশনের কাজ চলবে। আরও একটা কথা। যার নাম ড্রাফট লিস্টে এল, তার নাম কাটার আগে তাকে নোটিশ পাঠানো বাধ্যতামূলক; তারপরে হিয়ারিং, শেষে আপিল। যদি ৪ ডিসেম্বরের তালিকায় আপনার নাম ওঠে, তাহলেই। আর যদি না থাকে তাহলে নোটিশ হিয়ারিং, আপিল – কোনও কিছুই হবে না। এর ওপরে ভিত্তি করে জানুয়ারি জুড়ে তালিকা বিচার চলবে। ৭ ফেব্রুয়ারি ফাইনাল ইলেক্টোরেল রোল প্রকাশিত হবে। এটা তো কমিশনের এসআইআর করার পদ্ধতি।

এবারে আসছি, আমরা কেন এসআইআর-এর বিরোধিতা করছি। একটা কথা মাথায় রাখুন এসআইআর ভোটার লিস্ট রিভিশনের প্রক্রিয়া না। এসআইআর ভোটার লিস্টকে নতুন ভাবে তৈরি করার প্রক্রিয়া। কমিশন এটাই বলছে, পুরোনো ভোটার লিস্ট বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে নতুন ভোটার লিস্ট তৈরি হবে। আমাদের কোনও সাথী যদি বলে আমি ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪এ ভোট দিয়েছি – আমি কেন নেই? কমিশন বলবে আমি এসব মানি না। তুমি যেহেতু ৪ ডিসেম্বরে কর্ম ভরনি, তাই তোমার নাম বাদ। এটা রিভিশন নয়, সাদা কাগজে নতুন করে নাম লেখা। এটা ডিনোভো ফ্রেস ভোটার লিস্ট। প্রথম কথা।

দ্বিতীয় নম্বর কথা হল – এটা পুরোনো কালের কমিশনের অনুসরণ করা স্ট্যান্ডার্ড প্রক্রিয়া নয়। নির্বাচন কমিশন মিথ্যে বলছে। [সুজাত ভদ্রের থেকে ২০০২-এর নির্দেশ চেয়ে নিলেন।] সুজাত এর আগে তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, কমিশন বলছেন এসআইআর এর আগে ৮ বার হয়েছে। আমরা আবারও সে প্রসেস অনুসরণ করছি। এটা মিথ্যে।

কমিশন যখন বলল আমরা পুরোনো সময় অনুসরণ করে কাজ করছি – আমরা বললাম ঠিক আছে, পুরোনো অর্ডার দেখান। ওরা বলছেন আমরা ২০০২-এর অনুসরণ করছি। আমরা বললাম সেই অর্ডার দেখান। কমিশন বলল সে সব নেই। আমরা বললাম আমি আরটিআই করে চেয়েছি। সে বলল এই নির্দেশ আমরা দিতে পারব না। সংবাদপত্রকে বলল ফাইল হারিয়েগেছে। আমরা কায়দা করে নথি বের করলাম। এটা সুপ্রিম কোর্টে রাখলাম। এই নথি বলছে এবার যে কাজ হচ্ছে তার সঙ্গে ২০০২এর মিল নেই। এই হলে ২০০২-এর ভোটার লিস্টে নাম থাকা ব্যক্তিরা হাত তুলুন প্লিজ। ২০০২-এ কেউ আমরা এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছিলাম, কেউ নাগরিকত্বের প্রমান দিয়েছিলাম? [উপস্থিত সকলেই 'না' বললেন] নির্বাচন কমিশন আপনাকে জমা দিতে বলেছিল? [সকলেই সমস্বরে 'না' বললেন]। আমরা দেখলাম কমিশন স্রেফ মিথ্যে বলছে, অথচ সে বুক বাজিয়ে বলে চলেছে তারা পুরোনো ধরণের কাজ করছে – এর থেকে বড় মিথ্যে আর কি বা হতে পারে। ২০০২-তে স্পষ্টভাবে বিএলওকে বলে দেওয়া হয়েছিল আপনার নাগরিকত্ব যাচাই করার অধিকার নেই। এটা লেখা ছিল। অথচ আজ বিএলওকে বলে দেওয়া হয়েছে আপনাকে নাগরিকত্ব বিচারই করতে হবে। এসআইআর আদতে নাগরিকত্ব যাচাই করার জন্য হচ্ছে। সুজাত বলেছেন, ১৯৫০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত কমিশন বারবার লিখেছে নাগরিকত্ব যাচাই করা আমার অধিকারে পড়ে না। যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে বলে দেয় যোগেন্দ্র যাদব বিদেশি, তাহলেই একমাত্র কমিশন সে নাম তালিকা থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু আপনি বিদেশি কি না সেই চরিত্র বিচারের দায় কমিশনের নয় – স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের – ভারত সরকারের, অমিত শাহের। লালবাবু মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কমিশনকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল, এটা আপনার কাজ নয়। আমাদের দেশের আইন আছে, সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য আছে, খোদ কমিশন অন্তত ২০বার এই কথা বলেছে – এটা তার কাজ নয়। অর্থাৎ দু'নম্বর বক্তব্য হল এটা কোনও পুরোনো কাজের ধারাবাহিকতা নয় – ইট ইজ আনপ্রিসিডেন্টেড। অভূতপূর্ব।

তিন নম্বর বক্তব্য হল এস আইআর ভোটার লিস্ট সাফাই করার প্রক্রিয়া নয়। কমিশন বারবার বলেছে ভোটার লিস্টে সমস্যা আছে আমরা

সাফাই করছি। প্রথম কাজ হওয়া উচিত ডুপ্লিকেট নাম বাদ দাও। খুব সোজা কাজ – কম্পিউটারকে বল একই ফটো যোগেন্দ্র যাদব সন অব দেবেন্দ্র যাদব ভোটার লিস্টে অনেকবার যদি এসেছে তাহলে ডিলিট কর। আমি নিজে সুপ্রিম কোর্টে প্রমান নিয়ে গিয়ে বলেছি বিহারের ফাইনাল ভোটার লিস্টে ডুপ্লিকেট নাম আছে ৫ লাখ। ৭৫ হাজার ব্ল্যাঙ্ক নাম আছে। নামের জায়গায় কিছুই লেখা নেই – ব্ল্যাঙ্ক। [সুজাত ভদ্র জিজ্ঞেস করলেন, সুপ্রিম কোর্ট কি বলল?] যোগেন্দ্র বললেন সুপ্রিম কোর্ট বলেছে খুব খারাপ। সেই তালিকাতেই নির্বাচন হয়েছে। আমরা হলফনামা দিয়ে বলেছি। কোর্টে প্রমান দেবার পরেও তালিকা পালটায় নি। আমি আরও দেখিয়েছি কন্নড় আর তামিল ভাষায় লেখা নাম ছিল। কমিশন কাউন্টার এফিডেভিটে তাদের দুষ্কর্ম স্বীকার করেছে। তাও বদল হয় নি। সেই তালিকা নিয়েই বিহারে নির্বাচন হয়েছে। কমিশনের নিয়ম হল কোনও প্রমিসেসে যদি ১০-এর বেশি ভোটার থাকে তাহলে সেটার ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন বাধ্যতামূলক। বিহারে প্রথম ১০টা বাড়ি দেখিয়েছিলাম, যেখানে ৮০০র বেশি ভোটার। আমি দেখিয়েছি বিহারে ২১ লক্ষ বাড়িতে ১০এর বেশি ভোটার – এই সংখ্যা ৩ কোটির বেশি। বুঝতে পারছেন? এটা তো ফ্রড করা হল। ফলে এটা ভোটার তালিকা সাফাই করার জন্য করা হচ্ছে না, এটা বুঝে নিন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে জিজ্ঞেস করা ডুপ্লিকেট ধরার সফটওয়ার কেন ব্যবহার করছেন না? তিনি প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন তাদের ডুপ্লিকেট ধরার সফটওয়ারের প্রয়োজন নেই। আদতে এই প্রক্রিয়া চলছে ভোটার তালিকা থেকে বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়ার জন্য।

চার নম্বর – অবৈধ বিদেশি, ঘুষবৈঠিয়া, ইল্লিগ্যাল ফরেনার্স নিয়ে ব্যাপক প্রচার হয়েছিল বিহারের সীমাঞ্চল – পূর্নিয়া, কাটিহার, আরারিয়া ইত্যাদিতে। এখানে নাকি লাখ লাখ বিদেশি ঢুকে বসে আছে। তাই এসআইআর। এসআইআর চলাকালীন যখন বিভিন্ন সংখ্যা বর্ষার মত রোজ খবর কাগজে ছাপা হচ্ছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম এর মধ্যে বিদেশি কত? কেউ একটা বলল পরে জানাব। এসআইআর শেষ হয়ে গেল। তখনও আমি জিজ্ঞেস করলাম বিদেশি কত পেলে? কোনও উত্তর নেই। একই প্রেস কনফারেন্সে তিনজন সাংবাদিকের বারবার এই প্রশ্নে কমিশনার চুপ করেছিলেন। কোনও জবাব নেই। অথচ তিন মাস

অবৈধ বিদেশি, ঘুষবৈঠিয়া, ইল্লিগ্যাল ফরেনার্স বলে বলে প্রত্যেকের মাথা খারাপ করে দিয়েছিলেন। স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া দরকার এটা বিদেশি নাগরিকদের তাড়াবার প্রক্রিয়া নয়।

আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। ভারতে কোন রাজ্যে বিদেশি নাগরিক নিয়ে আন্দোলন কোন রাজ্যে সব থেকে বেশি হয়েছে? আসাম। ঠিক হোক, ভুল হোক – বিবাদ তো আছেই। যদি এসআইআরএর উদ্দেশ্য বিদেশি হঠানো, তাহলে সবার আগে আসামে এসআইআর হওয়া দরকার। যে ৮ রাজ্যে এসআইআরএর কথা বলা হল, সেখানে আসামের নাম ছিল না। কমিশনারকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন তার জন্য আলাদা নির্দেশ জারি হবে। অর্ডার জারি করে বলা হল আসামে বেনাগরিক বাছার কাজ কমিশন করবে না। সেখানে এনুমারেশন ফর্ম ভর্তি করতে হবে না, কারোর থেকে কাগজ চাওয়া হবে না। ভাবুন। এরা বলছে এসআইআর হওয়া দরকার কারন বিদেশিরা এ দেশে ঢুকে বসে আছে। অথচ আসামে বিদেশি ঝাড়াইবাছাই করছে না কমিশন। অথচ সব থেকে বেশি বিদেশি অনুপ্রবেশের অভিযোগ আসামে, আসামে বিদেশি পরিচয় চাওয়া হচ্ছে না। যুক্তি কি? বলে দিচ্ছি কি। আসামে ১৯ লক্ষ বিদেশি চিহ্নিত হয়েছে – যার মধ্যে ১২ লাখ হিন্দু, ৭ লাখ মুসলমান। এত দিন বিদেশিদের সব থেকে বেশি ভোট পেয়েছে বিজেপি। তাই সেখানে এসআইআর করলে বিজেপির ভোট কাটা যাবে। তাই আসামে নয়, এসআইআর হবে তামিলনাড়ুতে।

শেষে আবার একবার মনে করিয়ে দিই এসআইআর কি নয়

১। এসআইআর ভোটার লিস্ট রিভিশন নয়;

২। এসআইআর পুরোনো স্ট্যান্ডার্ড প্রসেসের রিপিটেশন নয়;

৩। এসআইআর ভোটার লিস্ট পরিষ্কারের উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে না;

৪। এসআইআর বিদেশি নাগরিকদের তাড়াবার হাতিয়ার নয়।

তাহলে এসআইআর কি?

১। এসআইআর বেনাগরিক তৈরি করার প্রক্রিয়া।;

২। ভোটার লিস্টে কাঁচি চালাবার প্রক্রিয়া;

৩। এসআইআর মানুষকে লিস্ট থেকে তাড়াবার প্রক্রিয়া।

কোন মানুষ? যারা বিজেপির কাছে মাথা ব্যথা। যারা বিজেপিকে ভোট দেয় না, তাদের ঝাড়াই করে বেছে বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়া।

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি। যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর, সেই জ্ঞান আমাদের আরাধ্য; আমরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনই জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজেই তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর-হকার-চাষীর এ এক অনন্ত সামাজিক শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় নিয়ে প্রতিমাসে কখনও একটা, কখনও একের বেশি পুথি প্রকাশ করে এই সময়কে বোঝার তাগিদে।

জ্ঞানগঞ্জ তত্ত্ব

১। টডের তরবারি - ভদ্রবিত্তের ইসলামোফোবিয়া
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। *আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে*
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। কৃষি পরাশর
১৮। প্রাক-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য
১৯। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - অমিয়কুমার বাগচীর সাক্ষাৎকার
২০। গঙ্গার ভাঙন গঙ্গার চর
২১। নাস্তিকের কুম্ভ জিজ্ঞাসা
২২। রংপুর ধিং - জাগো বাহে কোনঠে সবায়
২৩। ছাত্রশাসনতন্ত্র
২৪। ভদ্রবিত্তের আওরঙ্গজেবফোবিয়া ও মারাঠি হিন্দুরাষ্ট্রদর্শনের খোঁজে
২৫। ওয়াকফ আন্দোলন থেকে মুর্শিদাবাদ হিংসা: ফ্যাসিবাদী ইসলামোফোবিয়ার দুষ্টচক্র
২৬। কর্পোরেট আর বড়লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপাও
২৭। নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র
২৮। দখলদারিত্বের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত
২৯। দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব
৩০। দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে - উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা
৩১। বাঙলার হাট: একটি সাম্যবাদী পরম্পরা
৩২। 'কথামৃত' আনকাট এবং... 'কি করিতে হইবে (না) - আদিদেবের সঙ্গে আলাপচারিতা
৩৩। বনজঙ্গল গাছপালা
৩৪। আর নয় অঙ্গার - আদানির কয়লা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক প্রস্তাবনা
৩৫। হিমাংশু কুমারের সঙ্গে কথোপকথন
৩৬। অনন্ত ঋণের বাখান - দক্ষিণ এশিয়ায় আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্কের শোষণ কথা
৩৭। SIR বিহারে ও বাংলায়

জ্ঞানগঞ্জ প্রকাশনা